বাংলাদেশে ট্রেড ইউনিয়ন বিকাশে আইনি বাধা এবং প্রশাসনিক জটিলতা

গোলাম মুর্শেদ

বাংলাদেশে শিল্প কৃষি এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রে শ্রমিকেরা এখনও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ন্যুনতম অধিকার থেকে বঞ্চিত। এই বঞ্চনা বহুবিধ হলেও এর গোড়া হলো নিজেদের সংগঠিত করবার ক্ষেত্রে নানা প্রতিবন্ধকতা। ব্রিটিশ আমলে উপনিবেশ উপযোগী ট্রেড ইউনিয়ন আইন করা হয়েছিলো। তার ধারাবাহিকতাই পাকিস্তান ও বাংলাদেশ আমলে অব্যাহত থেকেছে। বাংলাদেশের শতকরা ৯০ ভাগেরও বেশি শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন বা কোনো সাংগঠনিক প্রক্রিয়ায় যুক্ত নন। ট্রেড ইউনিয়ন সংক্রান্ত আইন আর তার সাথে প্রশাসনিক নানা প্রতিবন্ধকতা রাষ্ট্রের বলপ্রয়োগের সাথে যুক্ত হয়ে তৈরি করেছে শ্রমিকদের ন্যুনতম অধিকার অর্জনের পথে অযুত বাধা। বর্তমান প্রবন্ধে আইন ও প্রশাসনের কিছু পরিকল্পিত বাধা চিহ্নিত করা হয়েছে। এটি দুইপর্বের প্রথম পর্ব

প্রেক্ষাপট

বাংলা অঞ্চলে শ্রমিক সমাজের পত্তন রেললাইন পাতার কাজের মধ্য দিয়ে ১৮৩০ সালের দিকে। পরে শ্রমিকেরা নিজেদের প্রয়োজনে সংগঠিত হয়, গড়ে তোলে সংগঠন। সেসব তৎপরতাকে একটি আইনি কাঠামোতে নিয়ে আসার জন্য ১৯২৬ সালে প্রণীত হয় 'দ্য ট্রেড ইউনিয়নস অ্যাক্ট'। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকার এমনভাবে আইনটি তৈরি করে, যাতে যথেষ্ট বিভ্রান্তি ও জটিলতা তৈরি হয়। একটি প্রমাণ দেয়া যাক। ইংরেজিতে প্রণীত আইনটির প্রথম আধ্যায়ের প্রথম ধারায় ট্রেড ইউনিয়নের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে :

1. (h) "Trade Union" means any combination, whether temporary or permanent, formed primarily for the purpose of regulating the relations between workmen and employers, or between workmen and workmen, or between employers and employers, or for imposing restrictive conditions on the conduct of any trade or business, and includes any federation of two or more Trade Unions.

[অনুবাদ : 'ট্রেড ইউনিয়ন' হলো এমন এক সংঘ, হোক তা অস্থায়ী বা স্থায়ী, যা গঠিত হওয়ার প্রাথমিক লক্ষ্য হলো শ্রমিক ও মালিকদের বা শ্রমিকদের সঙ্গে শ্রমিকদের অথবা মালিকদের সঙ্গে মালিকদের মধ্যকার সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করা এবং দুই বা ততোধিক ট্রেড ইউনিয়নের কর্মকাণ্ড এবং ব্যবসা বা বাণিজ্যের ওপরে নিয়ন্ত্রণমূলক শর্তারোপ করা।]

ট্রেড ইউনিয়ন যে শ্রমিকদের সংগঠন তা বিশ্বজুড়ে সর্বজনস্বীকৃত হলেও ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসকেরা শোষণ-নিপীড়ন জারি রাখার স্বার্থে এমন বিধি প্রণয়ন করে যে 'ট্রেড ইউনিয়ন কেবল শ্রমিকদের নয়, মালিকদেরও হতে পারে।' কার্যত এটা বলার মধ্য দিয়ে অত্যাচারী শাসকদের ভীতি ও কূটচরিত্র প্রকাশিত হয়। ট্রেড ইউনিয়ন নিয়ে আইনি বিভ্রান্তি সৃষ্টির এই ধারা পরে পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসকেরাও জারি রাখে। যার প্রমাণ মেলে 'শিল্প সম্পর্ক অর্ডিন্যান্স ১৯৬৯'-এ। সেখানে বলা হয়েছে : "ট্রেড ইউনিয়ন অর্থ শ্রমিকদের বা কর্মচারীদের যে কোনো সংঘ বা সমিতি যাহা গঠনের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হইতেছে শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে অথবা দুই শ্রমিকের মধ্যে অথবা দুই মালিকের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করা কিংবা যে কোনো ব্যবসায় বা বাণিজ্য পরিচালনার উপর নিয়ন্ত্রক শর্ত আরোপ করা এবং দুই বা ততোধিক ট্রেড ইউনিয়নের সমন্বয়ে গঠিত ফেডারেশনও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।"

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর শাসক দলগুলোও একই ধারা অব্যাহত রাখে। শিল্প সম্পর্ক (সংশোধনী) অর্ডিন্যান্স ১৯৮৫, শিল্প সম্পর্ক বিধিমালা ১৯৭৭, শ্রম আইন ২০০৬ এবং শ্রম (সংশোধন) আইন ২০১৩-তেও একই ধরনের বিভ্রান্তি জারি রাখা হয়েছে। সর্বশেষ সংজ্ঞা অনুযায়ী [ধারা-১ উপধারা-২(১৫)] : "'ট্রেড ইউনিয়ন' অর্থ ত্রয়োদশ অধ্যায়ের অধীন গঠিত ও রেজিস্ট্রিকৃত শ্রমিকগণের বা মালিকগণের ট্রেড ইউনিয়ন, এবং কোনো ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।"

ব্রিটিশ শাসকেরা এদেশে ঝামেলা বাধিয়ে রেখে গেলেও সে দেশের শ্রমিক আন্দোলনের চাপে ঠিক ঠিক সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছে। যুক্তরাজ্যের Trade Union and Labour Relations (Consolidation) অপঃ ১৯৯২-এ [ধারা-১] ট্রেড ইউনিয়নের বিবরণ দেয়া আছে। তাতে বলা হয়েছে : "In this Act a `trade union' means an organisation (whether temporary or permanent)—

(a) which consists wholly or mainly of workers of one or more descriptions and whose principal purposes include the regulation of relations between workers of that description or those descriptions and employers or employers' associations; or

(b) which consists wholly or mainly of—
(i) constituent or affiliated organisations which fulfil the conditions in paragraph (a) (or themselves consist wholly or mainly of constituent or affiliated organisations which fulfil those conditions), or
(ii) representatives of such constituent or affiliated organisations, and whose principal purposes include the regulation of relations between workers and employers or between workers and employers' associations, or the regulation of relations between its constituent or affiliated organisations."

আবার, Black's Law Dictionary মোতাবেক ট্রেড ইউনিয়ন হলো : A combination or association of men employed in the same trade, (usually a manual or mechanical trade,) united for the purpose of regulating the customs and standards of their trade, fixing prices or hours of labor, Influencing the relations of employer and employed, enlarging or maintaining their rights and privileges, and other similar objects. [Trade Union Act. The statute 34 & 35 Vict. c. 31, passed in 1871, for the purpose of giving legal recognition to trade unions, is known as the "trade-union act," or "trade-union funds protection act."]

এই দীর্ঘ আলোচনা ও নথিপত্র পেশ করার উদ্দেশ্য আইনি সমস্যার ধাঁচটি বোঝানো। মূল আলোচনার ভেতরে এসব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে। বাংলাদেশে ট্রেড ইউনিয়নের বিকাশ রুদ্ধ করতে আইনের মারপ্যাঁচের পাশাপাশি প্রশাসনিক জটিলতাও সৃষ্টি করা হয়েছে। তাই প্রশাসনিক বা সাংগঠনিক বাধাগুলোরও পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

সর্বশেষ শ্রম আইন

প্রায় ১৪ বছর ধরে সলাপরামর্শের পর, পূর্বে জারি থাকা মোট ২৫টি আইন রদ করে ২০০৬ সালে একটি অখণ্ড শ্রম আইন প্রণীত হয়। এটি পরে ২০০৯, ২০১০ ও ২০১৩ সালে সংশোধিত হয়। ২০১৫ সালে এর বিধিমালা পাস হয়। এখন বাংলাদেশে ট্রেড ইউনিয়ন সংক্রান্ত তামাম নিয়ম এ আইনের অন্তর্ভুক্ত। যদিও রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকাগুলোতে বিশেষ শ্রম আইন বহাল আছে এবং সেখানে ট্রেড ইউনিয়ন নয় বরং আরো বহুগুণ ঢিলেঢালা ও ব্যবস্থাপনার তল্পিবাহক 'শ্রমিকসভার' ধারণা চালু করা হয়েছে। এ ছাড়া শ্রম আইন কার্যকর হওয়ার জন্য ৩৫১ ধারা মোতাবেক যেসব বিধিমালা প্রণীত হওয়ার কথা ছিল, সেগুলো না হওয়াতে জটিলতা অনেক বেড়েছে। ২০১৩ সালের এ আইনটি ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকাণ্ডকে কিভাবে রুদ্ধ করেছে, সেটির অনুসন্ধানও জরুরি।

বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) আইন ২০১৩ : এটি ১৩ মে ২০১৩ তারিখে মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত হয়ে ২২ জুলাই ২০১৩-তে ছাপা হিসেবে প্রকাশিত হয়।

'শ্রমিক' আওতার সমস্যা : কারা শ্রমিক, কারা এ আইনের আওতাধীন থাকবে এবং যে শ্রমিকেরা এ আইনের অধীনে থাকবে না, তারা আদপে শ্রমিক হিসেবে পরিগণিত হবে কি না, তা নিয়ে বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে শ্রম আইনের দুটি ধারায়।

ধারা-১ উপধারা-৪

"...এ আইন নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহ বা শ্রমিকগণের উপরে প্রযোজ্য হইবে না। যথা : (ক-ত পর্যন্ত মোট ১৬টি)

ক. সরকার বা সরকারের অধীনস্ত কোনো অফিস...

ছ. মুনাফা বা লাভের জন্য পরিচালিত নহে এমন শিক্ষা, প্রশিক্ষণ বা গবেষণা প্রতিষ্ঠান...

ট. দফা খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ ও জ-তে উলিখিত কোনো প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত কোনো শ্রমিক, তবে দ্বাদশ, ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ অধ্যায়ের প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে নিযুক্ত, শিক্ষক ব্যতীত, অন্য কোনো শ্রমিক এই নিষেধের অন্তর্ভুক্ত হইবেন না...

ঢ. এমন কোনো কৃষি খামার, যেখানে সাধারণত পাঁচজনের কম শ্রমিক কাজ করেন...

ণ. গৃহ পরিচারক"

ধারা-২ উপধারা-৬৫

"...'শ্রমিক' অর্থ শিক্ষাধীনসহ কোনো ব্যক্তি, তাঁর চাকরির শর্তাবলি প্রকাশ্য বা উহ্য যেভাবেই থাকুক না কেন, যিনি কোনো প্রতিষ্ঠানে বা শিল্পে সরাসরিভাবে বা কোনো ঠিকাদারের, যে নামেই অভিহিত হোক না কেন, মাধ্যমে মজুরি বা অর্থের বিনিময়ে কোনো দক্ষ, অদক্ষ, কায়িক, কারিগরি, ব্যবসা উন্নয়নমূলক অথবা কেরানিগিরির কাজ করার জন্য নিযুক্ত হন, কিন্তু প্রধানত প্রশাসনিক, তদারকি কর্মকর্তা বা ব্যবস্থাপনামূলক কাজে দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন না।"

প্রথমোক্ত ধারায় অসংগঠিত ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের আইনের আওতার বাইরে রাখা হয়েছে। এ ছাড়া তাতে :

(ক) শ্রমিকের আওতা ও পরিসর যথেষ্ট বিভ্রান্তিকর ও বৈষম্যপূর্ণ। এতে শ্রমিকের সংজ্ঞা ও পরিধিকে সংকুচিত করা হয়েছে। অসংগঠিত ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের আইনের আওতার বাইরে রাখা হয়েছে; যদিও দেশের মোট শ্রমিকদের অধিকাংশই অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত। সর্বজনীন শ্রম আইনকে এভাবে ক্ষুদ্র একটি অংশের জন্য প্রযোজ্য করা হয়েছে। এ আইন মতে, বেসরকারি ও সরকারি অফিসের দুজন কম্পিউটার অপারেটর একই কাজ করলেও তাদের ওপরে ভিন্ন আইন প্রযোজ্য হবে। এমন বৈষম্যপূর্ণ আচরণ দেশের সংবিধানের পরিপন্থী।

(খ) কর্মক্ষেত্রকে মুনাফামুখী বা মুনাফাবিমুখ, সরকারি-বেসরকারি, গৃহ-বাহির ইত্যাদি অভিধা দিয়ে 'শ্রমের প্রকৃতি' ও 'শ্রমিক' সত্তাকে অস্বীকার করা হয়েছে। ফলে আইনের জটিলতা বেড়েছে।

(গ) আইন বলেছে অনেক শ্রমিক এ আইনের আওতার বাইরে থাকবে, যেমন–বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। এরা ট্রেড ইউনিয়ন করতে পারবে না। যদিও তা আন্তর্জাতিক মহলে এই পেশার শ্রমিকদের ইউনিয়ন নিষিদ্ধ নয়। যুক্তরাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষকদের ট্রেড ইউনিয়ন 'ইউনিভার্সিটি অ্যান্ড কলেজ ইউনিয়ন' এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

(ঘ) ২(৬৫) ধারাও খুব বিভ্রান্তিকর। এখানে ব্যবস্থাপনা, তদারকি ইত্যাদির মাত্রা নির্ধারিত হয়নি। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানেই শ্রমিকদের মধ্যে স্তর-পদবি ইত্যাদি ভেদ থাকে। শ্রমিকের সব সময়ই বিভিন্ন কাজের তদারকি বা ব্যবস্থাপনা করতে হয়। তাই আওতা নির্ধারিত না হলে শ্রমিকদের খুবই ছোট্ট একটি অংশ এ আইনের আওতায় আসবে। কার্যত শ্রমিকের কাজের ধরন, মানবিক পরিস্থিতি ও সামগ্রিক সত্তাকে প্রাধান্য না দেয়াতেই এ সংকটের সৃষ্টি।

আইনে দেয়া 'শ্রমিকের' সংজ্ঞা নয়, বরং শ্রমিকের জীবনের বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনা করলে তার মূল সত্তার দেখা মেলে। কার্যত জীবিকার্জনের জন্য (তা বর্তমানে বা ভবিষ্যতে যখনই হোক না কেন) যাদের শ্রম বিক্রির ওপরে ভরসা করতে হয়, তারা শ্রমিক। এদের মালিকানায় এত বেশি জমিজমা, কারখানা, খনি, খামার বা সেবাদানের এমন বৃহৎ কোনো প্রতিষ্ঠান থাকে না, যাতে তারা শ্রম বিক্রি না করে ওই সব সম্পত্তি থেকে প্রায় বিনাশ্রমে লব্ধ অর্থে দিব্যি বেঁচেবর্তে থাকতে পারে। এদের কারো কারো একটি-দুটি বাড়িঘর থাকতে পারে, কিন্তু সেগুলো তাকে ও তার পরিবারের সদস্যদের খাবার-পোশাক-শিক্ষা-চিকিৎসা-বিনোদন জোগানোর জন্য যথেষ্ট নয়। এই অর্থে একজন ছোট দোকানি বা রিকশাওয়ালাও শ্রমিক। কারণ তারা জীবিকার জন্য শ্রমের ওপর নির্ভরশীল। শ্রমিকের আরো কিছু সত্তা হলো :

- একজন শ্রমিক কাজের শুরুতে অর্থের বিনিময়ে ও নির্ধারিত-সময় ধরে কাজ করতে চুক্তিবদ্ধ হন (হোক তা লিখিত বা অলিখিত)। এ জন্য তাঁরা ঘণ্টা, দিন, সপ্তাহ, মাস বা বছরওয়ারি মজুরি পান।
- শ্রমিক সব সময়ই কারো না কারো অধীনে কাজ করেন।
- নিজেকে নিজ কর্মের নির্দেশক বা পরিচালক ভাবার সুযোগ বা অধিকার কোনোটিই শ্রমিকের থাকে না। তিনি অনিবার্যভাবে

নিজের জীবন (Life) ও নিয়তি (Destiny) নির্ধারণের ক্ষমতা হারাতে থাকেন।

- চাকরি হারানোর ভয় বা কাজ থেকে ছাঁটাই হওয়ার ভয় শ্রমিকদের নীরবে সারাক্ষণ আবিষ্ট করে রাখে।
- প্রতিষ্ঠানের নীতিনির্ধারণকারী ও চূড়ান্ত ব্যবস্থাপনা বিভাগে (যেমন–পরিচালকমণ্ডলীর সভা বা board of director-G) শ্রমিকের অংশগ্রহণ থাকে না। অর্থাৎ policy making বা নীতি নির্ধারণের কর্তৃত্ব বা দায়িত্ব কোনোটিই শ্রমিকের থাকে না।
- কায়িক বা বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রম দিয়ে শ্রমিকেরা বেতন বা মজুরি পান, মুনাফা নয়।
- মালিক তাঁর উৎপাদিত নানা পণ্য বা সেবার মূল্য নির্ধারণ করতে পারেন, কিন্তু শ্রমিক তাঁর একমাত্র পণ্যের [অর্থাৎ শ্রমের, যা তিনি কোনো নিয়োজক বা পুঁজিপতির কাছে বিক্রি করতে বাধ্য] দাম নির্ধারণ করতে পারেন না।
- পুঁজিবাদী উৎপাদন কাঠামোতে একজন শ্রমিক অন্তত চার ধরনের মানবিক বিচ্ছিন্নতার যাতনায় ভোগেন :

নিজের শ্রমে উৎপাদিত পণ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে;
কাজ একঘেয়ে প্রতীয়মান হওয়ায় তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে;
নিজের সামাজিক জীবনের ধারা হারিয়ে নিজে নিজের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে; এবং
চাকরির বা কাজের প্রতিযোগিতামূলক বাজারে নিজেকে টিকিয়ে রাখার জন্য স্বার্থপর হয়ে, বাকি শ্রমিকদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে।

এ বিষয়গুলো বিবেচনা করলে কারা শ্রমিক হতে পারেন এবং কেন তাঁদের অধিকার রক্ষার্থে ইউনিয়ন করার সুযোগ থাকা উচিত, সেটি সঠিকভাবে বোঝা যাবে।

> অসংগঠিত ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের আইনের আওতার বাইরে রাখা হয়েছে; যদিও দেশের মোট শ্রমিকদের অধিকাংশই অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত।

আবার অনেক দেশের আইন মতে, যাঁরা একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের চেয়ে কম অর্থ রোজগার করে, তাঁরা শ্রমিক বলে পরিগণিত হয়। ভারতে ১৯৪৭ সালে যে শিল্পবিরোধ আইন প্রণীত হয়, সেটিতে কাউকে শ্রমিক হিসেবে পরিমাপের জন্য বার্ষিক দেড় হাজার টাকা আয়কে একটি পরিমাপক হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এমন পরিমাপক নির্ধারণ কেবল বৈষম্যমূলকই নয়, খুবই বিপজ্জনক।

ইউনিয়নকে অসাধ্য সাধন করতে বাধ্য করা, কিলিয়ে কলা পাকানোর অভিনব ফন্দি আছে এ ধারায়।

ধারা-১৭৮ উপধারা-২(ক) এর (৫)

এতে বলা হয়েছে, ইউনিয়নকে নথিবদ্ধ করাতে হলে শ্রম পরিচালকের কাছে বেশ কিছু তথ্য দিয়ে আবেদন করতে হবে। তাতে সংযোজিত থাকতে হবে :

"(৫) যে প্রতিষ্ঠানের সহিত ট্রেড ইউনিয়নটি সংশিষ্ট তাহার নাম এবং উহাতে নিযুক্ত বা কর্মরত শ্রমিকের মোট সংখ্যা।"

আপাতভাবে এ ধারায় আপত্তির কিছু নেই। তবে বাংলাদেশের বিভিন্ন শিল্প, সেবা ও কৃষি খাতের প্রতিষ্ঠানগুলোর যে পরিস্থিতি এবং সেগুলোর তথ্যভাণ্ডারের সন্ধান লাভ যে ডুমুরের ফুলের মতোই দুর্লভ, তা অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রই ভালো জানেন। ধ্বসে পড়া রানা প্লাজায় যে পাঁচটি কারখানা ছিল, সেগুলোতে কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যা আজও জানাতে পারেনি কারখানাগুলোর কর্তৃপক্ষ। যেখানে খোদ মালিকেরাই শ্রমিকের মোট সংখ্যা খুঁজে বের করতে 'ব্যর্থ' হয়, সেখানে শ্রমিকদের উপর এ দায়িত্বটি চাপানো কি জুলুম নয়? শ্রমিকেরা ইউনিয়ন গঠন করা দূরে থাক, ইউনিয়ন করার চিন্তা করলেই মালিকেরা শ্রমিকদের চাকরিচ্যুত করেন। এমনটা ঘটছে আকছার। যদি শ্রমিকেরা ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশনের আবেদন করতে গেলে এতসব অফিসিয়াল তথ্য দিতে হয়, তাহলে প্রথমে প্রশাসনের কাছ থেকে মোট শ্রমিক সংখ্যা চাইতে হবে। আর প্রশাসন শ্রমিকদের ইউনিয়ন গঠনের উদ্যোগ দেখে বসে থাকবে, এমনটা হওয়ার কথা নয়।

শ্রমিকদের মালিকের কবলে ঠেলে দেয়া : ইউনিয়ন গঠনের প্রক্রিয়াকে আরো ঝুঁকিপূর্ণ করে দেয়া হয়েছে ধারা-১৭৮ এর উপধারা-৩ এর মাধ্যমে।

২০০৬ সালের শ্রম আইনের এ ধারায় বলা ছিল :

"শ্রম পরিচালক অথবা এতদসংশ্লিষ্ট বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপধারা (১) এর অধীন কোনো দরখাস্ত পাওয়ার পর, সেটির একটি কপি (ইউনিয়নের কর্মকর্তাদের তালিকাসহ) সংশ্লিষ্ট মালিককে অবগতির জন্য অবিলম্বে প্রেরণ করিবেন।"

শ্রমিক নেতা ও ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠকদের তীব্র আপত্তির মুখে সরকার এ ধারাটি বাতিলের উদ্যোগ নেয়। সংগঠকদের বক্তব্য ছিল, ইউনিয়ন করতে ইচ্ছুক এমন শ্রমিকদের তালিকা হাতে পাওয়া মাত্র নিয়োজকেরা তাদের ছাঁটাইয়ের উদ্যোগ নেয়। সে সময় শ্রম পরিদপ্তর বা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা শ্রমিকদের চাকরি রক্ষার জন্য আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে বরাবরই ব্যর্থ হয়। তা ছাড়া যেহেতু মালিকপক্ষের অবগত হওয়াতে শ্রমিকদের ইউনিয়ন গঠনের সুযোগ সংকুচিত হয়, তাই এ বিধান আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) 'সংগঠন করার স্বাধীনতা এবং সংগঠিত হওয়ার অধিকার বিষয়ক সমঝোতা' (সমঝোতা নম্বর ৮৭) ; ১৯৬৯ সালের শিল্প সম্পর্ক অর্ডিন্যান্সের ৭ নম্বর ধারা (ট্রেড ইউনিয়ন ও সমিতি গঠনের স্বাধীনতা); শিল্প সম্পর্ক বিধিমালা ১৯৭৭ এবং শিল্প সম্পর্ক (সংশোধনী) অর্ডিন্যান্স ১৯৮৫-র সঙ্গে সাংঘর্ষিক।

২০১৩ সালের সংশোধনীতে এই ধারা পরিবর্তিত হয়ে দাঁড়ায় :

"১৭৮(৩) শ্রম পরিচালক অথবা এতদসংশ্লিষ্ট বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপধারা (১) এর অধীন প্রতিষ্ঠানপুঞ্জের জন্য কোনো ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তির পর আবেদনকারীর নিজ খরচে সেটির একটি কপি কর্মকর্তাদের তালিকাসহ গণবিজ্ঞপ্তি প্রচার করিবেন।"

কিন্তু এতে মুশকিল আরো বাড়ে। আগে মালিককে চিঠি পাঠিয়ে জানানোর ব্যবস্থা করত শ্রম পরিদপ্তর, আর এখন কয়েক গুণ বেশি অর্থ খরচ করে, গণবিজ্ঞপ্তি জারি করে মালিক ও তাঁর লোকেদের জানাতে হবে খোদ শ্রমিকদেরই।

ইউনিয়নের কাঠামোর ওপর হস্তক্ষেপ

এই ধারা অনুযায়ী, নিবন্ধিত হতে হলে ইউনিয়নের গঠনতন্ত্রে :

"ধারা-১৭৯ উপধারা-১(ট) : কর্মকর্তাগণের সংখ্যা, যাহা বিধি দ্বারা নির্ধারিত, পাঁচজনের কম এবং পঁয়ত্রিশ জনের বেশি হইবে না।"

ইউনিয়নের কাঠামো বা পরিসরের ওপর এ ধরনের হস্তক্ষেপের বিষয়টি আইএলও সমঝোতা ৮৭-র বিরোধী। কারণ সমঝোতা অনুযায়ী, শ্রমিকেরাই ঠিক করবেন, তাঁদের কমিটি কতজনের হবে বা সেটির পরিসর কতটা বড় বা ছোট হবে।

ইউনিয়ন গঠনে ৩০ শতাংশের সম্মতি সংক্রান্ত জটিলতা

"ধারা-১৭৯ উপধারা-২ : শ্রমিকগণের কোনো ট্রেড ইউনিয়ন এ অধ্যায়ের অধীন রেজিস্ট্রিকরণের অধিকারী হইবে না, যদি না যে প্রতিষ্ঠানে তা গঠিত হয়েছে, সে প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত শ্রমিকগণের মোট সংখ্যার অন্যূন শতকরা ত্রিশ ভাগ শ্রমিক সেটির সদস্য হন।

তবে শর্ত থাকে যে, একই মালিকের অধীন একাধিক প্রতিষ্ঠান যদি একই শিল্প পরিচালনার উদ্দেশ্যে একে অপরের সহিত সংশিষ্ট ও সম্পর্কযুক্ত হয়, তবে তাহারা যেখানেই স্থাপিত হোক না কেন, এই উপধারার উদ্দেশ্যে একটি প্রতিষ্ঠান বলিয়া গণ্য হইবে।"

এ ধারাটি বহু বিতর্কিত। ১৯৬৯-এর শিল্প সম্পর্ক অর্ডিন্যান্সের ১০ ধারায় বলা হয়েছিল : "তদন্তের পর রেজিস্ট্রারার কোনো ট্রেড ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বাতিল করিতে পারেন যদি তিনি দেখিতে পান যে, উক্ত ট্রেড ইউনিয়ন–(চ) কোনো প্রতিষ্ঠান বা গ্রুপ অব প্রতিষ্ঠানের মোট শ্রমিকের শতকরা ৩০ ভাগেরও কম ইহার সদস্য সংখ্যা।"

এটি ১৯৮৫ সালের শিল্প সম্পর্ক (সংশোধনী) অর্ডিন্যান্সে এভাবে প্রতিস্থাপিত হয় যে : "(চ) যে শিল্প প্রতিষ্ঠান বা শিল্প গোষ্ঠীর জন্য উহা গঠিত হইয়াছিল, সেখানকার শ্রমিকদের মধ্যে উহার সদস্য সংখ্যা শতকরা ৩০ ভাগের কম হইয়া পড়ে।"

১৯৬৯-এর শিল্প সম্পর্ক অর্ডিন্যান্সের ৭(২) ধারায় বলা হয়েছিল : "রেজিস্ট্রেশনের জন্য কী কী প্রয়োজন :...(২) সংশিষ্ট প্রতিষ্ঠানের শতকরা ৩০ ভাগ কর্মচারী সদস্যভুক্ত না হইলে সেই ইউনিয়ন এই অর্ডিন্যান্সের অধীনে রেজিস্ট্রেশন পাইবে না।"

খুব সাদামাটাভাবে দেখলে এ ধারাটিতে আপত্তির কিছু থাকার কথা নয়। তবে মুশকিল হয়, যখন একটি কারখানায় ১৫০০০ বা ২০০০০ বা আরো বেশি শ্রমিক নিয়োজিত থাকে। তখন একটি দরখাস্ত করার জন্য প্রায় ৪৫০০ বা ৬০০০ শ্রমিক বা তারও বেশি শ্রমিকের স্বাক্ষর গ্রহণের পর আবেদন করতে হয়। এমনিতে বাংলাদেশের কারখানাগুলোতে নিয়োজকদের চাপে শ্রমিকেরা সংগঠিত হতে পারেন না, তার ওপর যদি এত সব শ্রমিককে একমত করাতে হয়, তবে তা নিশ্চিতভাবেই মালিকের কানে যাবে এবং ইউনিয়ন করার প্রচেষ্টা ভণ্ডুল হয়ে যাবে।

অতীতে (বিশেষত ব্রিটিশ ও পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক আমলে) দেশের ট্রেড ইউনিয়নগুলোর কমিটিতে 'ওই কারখানা বা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত নয়' বরং বেশ দক্ষ ও শিক্ষিত ব্যক্তিরা নির্বাচিত হয়েছিলেন; যেমন–মওলানা ভাসানী প্রমুখ।

ট্রেড ইউনিয়নের ধারণা সংক্রান্ত জটিলতা

"ধারা-১৮০ উপধারা-১(খ) : ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য বা কর্মকর্তা হওয়ার অযোগ্যতা :...(খ) যে প্রতিষ্ঠানে ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করা হইয়াছে উক্ত প্রতিষ্ঠানে তিনি শ্রমিক হিসাবে নিয়োজিত বা কর্মরত না থাকেন।

তবে শর্ত থাকে যে, রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প সেক্টরের ক্ষেত্রে ইউনিয়নের সদস্যরা ইচ্ছা পোষণ করিলে ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির মোট কর্মকর্তার শতকরা দশ ভাগকে (১০%) নির্বাচিত করিতে পারিবে, যাহারা উক্ত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত নয়।"

অদ্ভুত ও বৈষম্যপূর্ণ বিধি। কেবল নিয়োজক, শ্রমিক আর পুঁজিপাট্টা থাকলেই কারখানা চলে না। এর জন্য প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনা বিভাগেরও প্রয়োজন হয়। কারখানায় নিয়োজক তার পক্ষ হয়ে কাজ চালানোর জন্য ব্যবস্থাপনা, মানবসম্পদ, হিসাব ইত্যাদি বিভাগ তৈরি করে এবং এগুলোতে কর্মকর্তাদের নিয়োগ দেয়। শ্রমিকদের পক্ষ হয়ে কাজ করার জন্য তৈরি হয় ইউনিয়ন এবং এটি চালানোর জন্য শ্রমিকেরা কর্মকর্তা নির্বাচন করেন। কাজ সুষ্ঠুভাবে চালানোর জন্য নিয়োজক যেমন তার বউ-ভাই-ছেলেপুলেদের বাইরে অভিজ্ঞ ও দক্ষ লোকেদের নিয়োগ দেয়, তেমনি ইউনিয়ন চালানোর জন্যও শ্রমিকেরা পারঙ্গম ও তাকতওয়ালা লোকেদের নিয়োগ দেন, দেয়ার প্রয়োজন বোধ করেন।

এ কারণেই কারখানা বা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত নয়, এমন লোকেদেরও ইউনিয়নে নিয়োগ দেয়া জরুরি। অতীতে শিল্প সম্পর্ক অর্ডিন্যান্স ১৯৬৯-এর ৭(ক) ধারায় 'ট্রেড ইউনিয়নের কর্মকর্তা হওয়ার অযোগ্যত-া'র বিবরণে এ ধরনের অদ্ভুত বিধি অন্তর্ভুক্ত ছিল না। বরং সেখানে ছিল : "অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে গঠিত ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য কর্মকর্তা হইলে ট্রেড ইউনিয়নের কর্মকর্তা পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতার বা নির্বাচিত হওয়ার জন্য সেই ব্যক্তি যোগ্য বলিয়া গণ্য হইবে না।"

তবে শিল্প সম্পর্ক (সংশোধনী) অর্ডিন্যান্স ১৯৮৫-এর ৭(ক) ধারায় কোনো ট্রেড ইউনিয়নের কর্মকর্তা বা সদস্য হওয়ার অযোগ্যতা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে : [উপধারা-১(খ)] কোনো ট্রেড ইউনিয়নের গঠনতন্ত্রে বা বিধিমালায় যাহাই থাকুক, কোনো ব্যক্তির অধিকার থাকিবে না–কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠানে বা শিল্প গোষ্ঠীতে গঠিত কোনো ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য বা কর্মকর্তা হইবার, যদি সে উক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের বা শিল্প গোষ্ঠীর চাকরিতে নিয়োজিত না থাকে বা কখনও সেখানে চাকুরি না করিয়া থাকে।

অতীতে (বিশেষত ব্রিটিশ ও পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক আমলে) দেশের ট্রেড ইউনিয়নগুলোর কমিটিতে 'ওই কারখানা বা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত নয়' বরং বেশ দক্ষ ও শিক্ষিত ব্যক্তিরা নির্বাচিত হয়েছিলেন; যেমন–মওলানা ভাসানী প্রমুখ। বিষম নিপীড়ন ও পেষণের মধ্যে পড়ে শ্রমিকদের বেশির ভাগই জীবনে কখনো লেখাপড়া করার ও আইনকানুন ঘাঁটার সুযোগ পান না। তখন 'বাইরের ওই সব ব্যক্তি' শ্রমিকদের হয়ে ন্যায়সংগত ও আইনানুগ দেন-দরবারগুলো করতেন। শ্রমিকেরা যাতে কাজ হারালেও সবটুকু পাওনা ঠিকমতো বুঝে পান, সে জন্য উদ্যোগ নিতেন ওই সব 'বাইরের' ব্যক্তিরা। এর ফলে শ্রমিকদের ঠকানো মালিকদের বা প্রশাসনের পক্ষে কঠিন হয়ে যেত। এই ব্যক্তিরা শ্রমিকদের জন্য অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও তাদের শিশুদের জন্য পূর্ণ শিক্ষার দাবিতে সোচ্চার থাকতেন। এভাবে শ্রমিকেরা যোগ্য নেতার অধীনে সংগঠিত হতে পারতেন। আবার কখনো কখনো রাজনৈতিক সংগঠনের কর্মীরা ইউনিয়নের সদস্য হয়ে শ্রমিকদের শিক্ষিত ও সংগঠিত করার চেষ্টা করতেন। এতে শ্রমিকদের মধ্যে রাজনৈতিক অধিকার, সাম্য ও দেশপ্রেমের বিকাশ ঘটত এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিকাশ ঘটত।

বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত এটাই রীতি যে শ্রমিকেরা ইউনিয়ন করতে চাওয়া মাত্র নিয়োজক তাদের বরখাস্ত করবে বা ছাঁটাই করবে। দর-কষাকষি করতে গিয়ে, অধিকার আদায়ের সংগ্রাম করতে গিয়ে বা অন্য কোনো কারণে ইউনিয়ন সংগঠক প্রায়ই মালিক, তার প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার রোষের বা ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে বরখাস্ত হন। তখন তিনি [বর্তমান আইনানুযায়ী] আর ইউনিয়নের কমিটির সদস্য থাকতে পারবেন না। তখন শ্রমিকদের নতুন করে কমিটি নির্বাচিত করতে হয়। দু-এক মাস পর পর এসব ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটতে থাকলে, শেষমেশ ওই ইউনিয়নই অকার্যকর হয়ে যায়। এভাবে মালিকপক্ষ আইন মেনেই ইউনিয়নের কার্যক্রম বন্ধের সুযোগ নেয়। (আগামী সংখ্যায় সমাপ্ত)

গোলাম মুর্শেদ: সদস্য, নির্বাহী কমিটি, বাংলাদেশ শ্রম ইন্সটিটিউট (বাশি)
ইমেইল: murshedpost@gmail.com